Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পিছনে যে সমস্ত বাধা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Rubya Tazin

রোলঃ 216021035

২৮ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পিছনে যে সমস্ত বাধা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Rubya Tazin

রোলঃ 216021035

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পিছনে যে সমস্ত বাধা" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে Rubya Tazin, আইডিঃ 216021035 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পিছনে যে সমস্ত বাধা" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Rubya Tazin

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৮ মে, ২০২৪ ইং

Rubya Tazin

আইডিঃ 216021035

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভুমিকা:..5

আখিরাতে উন্নতির পেছনে বাধা হিসেবে যেসকল জিনিস কাজ করে: 6

নফস কি?..7

নফস বা আত্মা, তার রূপ এবং নফস বা আত্মার বৈশিষ্ট্য" 8

নফসের প্রকারভেদ :...9

নফসের পরিশুদ্ধি জীবন-সফলতার মানদণ্ড..12

অন্তরের রোগ ও তার একটি প্রকাশ...13

অন্তরের রোগ বৃদ্ধি পায় কিভাবে 14

অন্তরের সুস্থতা-অসুস্থতা দেহেও প্রভাব ফেলে..15

রুগ্ন অন্তরের অবস্থা..15

মন কি বলে আর প্রবৃত্তি কি চায়...16

আত্মশুদ্ধি বা আত্মার চিকিতসা।..19

আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব 27

রমজানের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি...32

নফস' সম্পর্কে আলেম-উলামা ও সুফীদের বানী সমূহঃ...33

মন্তব্যঃ...38

"আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পেছনে নফসের বাধা"

ভুমিকা:

আখিরাতে উন্নতির অন্তরায় অনেক কিছুই কাজ করে থাকে। তার মধ্যে ৮০% বাধার পেছনেই থাকে নফসের হাত ।আমাদের নফস মুলত দুনিয়াবি চাহিদা গুলো পুরনের মাধ্যমে আখিরাতের উন্নতিতে বাধা সৃষ্টি করে। নফসের এই চাহিদা গুলো পুরন করতেই মানুষ নানাবিধ অপকর্মে জড়িত হয়।ফলস্বরূপ সমস্ত নেক আমল সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।

হাদিসে আছে, মানুষের বুকের ভেতরে বাম দিকে একখ- মাংসপি- আছে, যার সেটা ভালো, সে ভালো; আর যার সেটা খারাপ, সে খারাপ এবং সেটাই অন্তর। ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ দেহভিত্তিক যা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের সমষ্টি। এই পাঁচ ইন্দ্রিয় ষড়রিপুকে বহন করে থাকে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, গর্ব ও হিংসা। তাই যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিচালিত হয়, সে অসৎ কাজ করে, সে কুনফসের অধিকারী এবং তার দিলে কালিমা ও মরিচা পড়ে, আর যে কোরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী সৎকাজ করে তার নফস আলোকিত হয় এবং কলবে নুর সৃষ্টি হয়, যা শাশ্বত। এই নুরকে কেউ ধ্বংস করতে পারে না। এই কালিমাকে পাপ বলে আখ্যায়িত করা হয়, আর আলো বা নুরকে পুণ্য বলে

আখিরাতে উন্নতির পেছনে বাধা হিসেবে যেসকল জিনিস কাজ করে:

১.লাগামহীন নফস

২.শিরক

৩.কুফর

৪.ইবাদাতে অমনোযোগীতা ও উদাসীনতা।

৫.আখিরাত বিমুখী চিন্তা ভাবনা।

৬.লোভ লালসা

৮.গীবত

৯.সময়ের সঠিক ব্যবহারে সচেতন না হওয়া।

১০.অন্যের হক নষ্ট করা

১১.অলস জীবন যাপন করা ইত্যাদি।

নফস কি?

নফস একটি আরবি শব্দ যার আক্ষরিক অর্থ হল "সত্বা এবং একে "মন", "অহংবোধ" বা "নিঃশ্বাস" হিসেবে অনুবাদ হয়। শব্দটি হিব্রু শব্দ নেফেস এর সমতুল্য। কুরআনে নফস শব্দটি স্বতন্ত্রবাদী (আয়াত ২:৪৮) এবং সমষ্টিগত (আয়াত ৪: ১) উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যা ইঙ্গিত দেয় যে যদিও নফসের ইতিবাচক গুণাবলী ধারণ করার মধ্যেই মানবতা কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে, এই গুণগুলো "স্বাধীন ইচ্ছা"র কর্তৃত্ব চর্চার জন্যও ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকে, যে ক্ষমতাটি নফস তাদেরকে দিয়ে থাকে।

নফস বিষয়ক বেশিরভাগ জনপ্রিয় সাহিত্যে পরিভাষাটির সুফিবাদী ধারণার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। সুফি দর্শন অনুসারে, অপরিশোধিত অবস্থায় নফস হল "অহং", যাকে তারা কোন ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ অস্তিত্বের সর্বনিম্ন মাত্রা - তার জৈবিক এবং শয়তানী প্রকৃতি হিসাবে বিবেচনা করে। নফস হল ইসলামী ঐতিহ্যের একটি বিশেষ ধারণা, বিশেষত সুফিবাদে এবং শিয়া ইসলামের ইরফান নামক শাস্ত্রে, যাকে প্রাচীন গ্রিক ধর্ম অনুসারে গ্নোসিস বলে ডাকা হয়।

নফস হলো মুলত মানুষের প্রবৃত্তি বা চাহিদা সমুহ।মহান আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বেঁচে থাকার জন্য মানুষের মাঝে কিছু কামনা বাসনা দান করেছেন।সেগুলো ই সাধারনত নফসের অন্তর্ভুক্ত।

নফস বা আত্মা, তার রূপ এবং নফস বা আত্মার বৈশিষ্ট্য"

নফসের পরিশুদ্ধতা ছাড়া মুমিন হওয়া সম্ভবপর নয় এবং কোন পাপ কাজ থেকে বেচে থাকাও সম্ভব নয়। মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া নফসকে নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব নয়। তাই নফসকে পরিশুদ্ধ করার জন্য সদা সর্বদা মহান আল্লাহর নিকট পানাহ চাইতে হবে। সব সময় আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করতে হবে এবং নফসকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতে হবে; তাহলে পাপ কাজ বা খারাপ কাজ থেকে বেচে থাকতে আল্লাহ সাহায্য করবেন।

মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

"যে ব্যক্তি নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয় এবং বিফলকাম বা ব্যর্থ হয় সেই ব্যক্তি, যে নিজেকে পাপাচারে কলুষিত করে"।

***সূরা আশ-শামসঃ আয়াতঃ ৯-১০

নফসের কার্যক্রম ও বিভিন্ন অবস্থানের কারনে নফসকে তথা মানুষকে বা তার কার্যক্রমকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা হয়ে থাকে।

মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

"আল্লাহর নিকট মানুষের মর্যাদা বিভিন্ন স্তরের এবং আল্লাহ দেখেন যা কিছু তারা করে"।

***সূরা আল-ইমরানঃ আয়াত-১৬৩।

নফসের প্রকারভেদ :

অবস্থানের দিক থেকে নফস সাধারণত ৩ প্রকার।

১.নফসে আম্মারাহ

২.নফসে লাওয়্যামাহ

৩.নফসে মুত্বমাইন্নাহ।

১.নফসে আম্মারাহ

সাধারণত যে নফস মানুষকে কুপ্রবৃত্তির দিকে আকৃষ্ট করে তাকে নফসে আম্মারাহ বলে।একে প্রতারক আত্তাও বলা যেতে পারে।এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন এ বলা আছে..

۞ وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِىٓ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىٓ ۚ إِنَّ رَبِّى غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অনুবাদ: আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না। মানুষের মন অবশ্যই মন্দ কর্ম প্রবণ।কিন্তু সে নয় যার প্রতি আমার রব অনুগ্রহ করেন।নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।
(সুরা ইউসুফ : আয়াত ৫৩)

২.নফসে লাওয়্যামাহ

নফসে লাওয়্যামাহ হলো সেই নফস যা অন্যায় কাজ করার পর হৃদয়ে অনুশোচনার উদ্রেক করে,নিজেকে ধিক্কার জানায়।অর্থাৎ এই নফস কৃত কর্ম বা ওয়াজিব কাজ

গড়িমসির জন্য নিজেকে ধিক্কার জানায়।হাসান বসরি রহ: বলেছেন, মুমিন তো নিজেকে সর্বাবস্থায় ধিক্কার জানায়, তা সে ভালো কাজই হোক অথবা মন্দ কাজ।

৩. নফসে মুত্বমাইন্নাহ

যে নফস যাবতীয় মহৎ চিন্তা দিয়ে পরিপূর্ণ ও পরিতৃপ্ত।একে প্রশান্ত আত্মা ও বলা যেতে পারে।নফসে মুত্বমাইন্নাহ সব ধরনের খারাপ চিন্তাভাবনা থেকে মুক্ত।
এই প্রশান্ত আত্মা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন.

يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفۡسُ ٱلۡمُطۡمَئِنَّةُ ٢٧ٱرۡجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةٗ مَّرۡضِيَّةٗ ٢٨

অর্থ: হে প্রশান্ত আত্মা, তুমি তোমার পালন কর্তার কাছে ফিরে যাও,সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে।
(সুরা ফজর:২৭-২৮)

কিছু আলেম-উলামা নফসকে আরও দুইটি ভাগে বৃদ্ধি করেছেন। যেমনঃ-

১) নফসে মুলহেমাঃ

"কসম বা শপথ মানুষের আত্মার বা প্রাণের এবং যিনি মানুষকে আকৃতিতে সুবিন্যস্ত ও সুঠাম করেছেন, অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান বা তাকওয়া দান করেছেন"।

***সূরা আশ-শামসঃ আয়াতঃ ৭-৮।

এই আয়াতদ্বয়ের তাৎপর্য্য হলঃ যেগুলো মন্দ কাজ সেগুলো পরিত্যাগ করতে হবে এবং যেগুলো পূন্যের কাজ সেগুলোকে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহর অনুগ্রহেই এটা হয়ে

থাকে। যেমনঃ খিজির(আঃ) নবী মূসা(আঃ)-কে বলেছিলেনঃ "আমি নিজের ইচ্ছায় কিছুই করিনি এবং এই ইচ্ছা যাতে তুমি সবর করতে পারনি- তারতাবীল"।

এখানে বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্তরা এলহাম প্রাপ্ত হয়েই সব কিছু করে থাকেন। যাহা সাধারন মানুষ অনুধাবন করতে পারে না এবং বোধগম্য না হলেও - তা কল্যানময়।

২) নফসে রহমানীঃ

এই শ্রেনীর নফস সম্পর্কে কিছু আলেম বলেছেন যে, নফসে মুলহেমা কায়েম-দায়েম হলে এবং রহমানুর রহীম আল্লাহর খাসলত হাসিল হলেই নফসে রহমানী লাভ সম্ভবপর হয়। যেমনঃ

আল্লাহ বলেছেনঃ

"আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করেছি। আল্লাহর রং এর চাইতে উত্তম রং আর কার হতে পারে?আমরা তাঁরই এবাদত করি"।

***সূরা বাকারাহঃ আয়াত-১৩৮।

আলেমরা এই আয়াতের অর্থকে বুঝিয়েছেন, আল্লাহর গুনে গুনান্বিত হও, আল্লাহর শানে শানান্বিত হও। তাই যদি কেউ রহমানুর রহীমের খাসলত ধারন করতে পারে, তবে তারাই হবে পূন্যময় এবং সর্বোত্তম। যেমনঃ

আল্লাহ বলেছেনঃ

"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতর আকৃতিতে বা অবয়বে"।

***সূরা আত্ব-তীনঃ আয়াত-৪।

নফসের পরিশুদ্ধি জীবন-সফলতার মানদণ্ড

একজন মানুষের দুনিয়াবী জীবনের কীর্তি ও সৌন্দর্য এবং পরকালীন জীবনের স্থায়ী সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা থাকে তার নফসের। নফসের শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা, নির্মলতা ও কলুষতা এবং পবিত্রতা ও অপবিত্রতা— প্রতিনিয়তই প্রকাশ পেতে থাকে তার প্রতিটি পদক্ষেপে। জীবনের এ পদক্ষেপগুলোই মানুষকে দাঁড় করিয়ে দেয় হয়ত সফলতার উচ্চ শিখরে কিংবা ব্যর্থতার গভীর গিরিখাদে। তাই কুরআন মাজীদ খুব পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে এ নিগূঢ় রহস্য। ইরশাদ করেছে—

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا.

অবশ্যই সে সফল হয়েছে, যে নফসকে পরিশুদ্ধ করেছে। আর সে ব্যর্থ হয়েছে, যে তা বিনষ্ট করেছে। —সূরা শামস (৯১) : ৯-১০

নফসকে পরিশুদ্ধ করার অর্থ হল, সব ধরনের পাপাচার ও কলুষতা থেকে মুক্ত করা। পাপচিন্তা, পাপ-ইচ্ছা ও পাপাচারী মানসিকতা থেকে রক্ষা করা। প্রবৃত্তি ও রিপুশক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। মনের সকল চাহিদা ও ইচ্ছাকে আকল ও বিবেকের অনুগামী করা। এরপর আকল ও বিবেককে আল্লাহ তাআলার হুকুম ও বিধানের অনুগত করা।

নফসকে বিনষ্ট করার অর্থ হল, বিভিন্ন প্রকারের গোনাহ ও মন্দকাজে লিপ্ত হয়ে নিজের চিন্তা, কর্ম ও মন-মানসিকতাকে পাপাচ্ছন্ন করে ফেলা। মনের সকল ইচ্ছা ও চাহিদাকে অনুসরণ করে করে প্রবৃত্তি-রিপুকে শক্তিশালী করা এবং আকল ও বিবেককে রিপুর অনুগামী করা। এভাবে আল্লাহর হুকুম ও বিধান থেকে সরে গিয়ে নিজের কামনা ও বাসনার অনুগত হওয়া। (দ্র. তাফসীরে ইবনে কাসীর ৪/৮১৬; রূহুল মাআনী ১৫/১৬৫; তাফসীরে উসমানী, পৃষ্ঠা ৭৯৩

অন্তরের রোগ ও তার একটি প্রকাশ

বিভিন্ন কারণে আমাদের দেহে যেমন রোগ-জীবাণু বাসা বাঁধে, তেমনি আমাদের অন্তরেও নানা প্রকারের রোগ ও ব্যাধি তৈরি হয়। সেজন্য আমাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করার ক্ষেত্রে প্রথম কাজ হল, সব ধরনের রোগ-ব্যাধি থেকে তাকে মুক্ত করা।

কুরআন মাজীদে অন্তরের রোগ ও তার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে উল্লেখিত একটি আয়াত সব সময় স্মরণ রাখার মতো। সেখানে নবীপত্নীদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ...

যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বনকারী হয়ে থাক, তবে পর-পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে কথা বলো না। অন্যথায় যার অন্তরে রোগ আছে সে লালসায় পড়বে। —সূরা আহযাব (৩৩) : ৩২

এখানে নারী কণ্ঠের কোমলতায় লালসার শিকার হওয়া থেকে সতর্ক করতে গিয়ে বলা হয়েছে, তাতে এমন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যার অন্তরে রোগ আছে।

এখানে রুগ্ন অন্তরের কেবল একটি প্রকাশ তুলে ধরা হয়েছে। বাস্তবে এমন অন্তরের মানুষ নানাক্ষেত্রে নানান রকম গোনাহ ও পেরেশানীর শিকার হয়ে থাকে। জীবনের নানা ক্ষেত্রে তাদের কষ্ট ও দুর্ভোগ মনোজগতের অস্থিরতা কেবল বৃদ্ধিই করতে থাকে। ফলে জীবন ও জগৎ দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। পঙ্কিলতায় ছেয়ে যায় সকল ভাব ও ভাবনা।

অন্তরের রোগ বৃদ্ধি পায় কিভাবে

অন্তরের এজাতীয় রোগ ও ব্যাধি কীভাবে বৃদ্ধি পায় সে বিষয়ে পরিষ্কারভাবে আলোচনা করা হয়েছে একটি হাদীসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

‘বান্দা যখন কোনো গোনাহ করে তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। এরপর যখন সে গোনাহ থেকে নিবৃত্ত হয়, ক্ষমা চায় এবং তাওবা করে তখন তার অন্তর পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। নতুবা পুনরায় গোনাহ করতে থাকলে সেই কালো দাগ আরও বাড়তে থাকে। একপর্যায়ে পুরো অন্তর (কালো দাগে) ছেয়ে যায়। সেটাকেই আল্লাহ তাআলা মরিচা বলে উল্লেখ করেছেন—

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰي قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ .

বরং তাদের কৃতকর্ম তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে। [সূরা মুতাফফিফীন (৮৩) : ১৪] —জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৩৩৪

মরিচার আস্তর জমে লৌহধাতু যেমন তার স্বাভাবিকতা, স্বচ্ছতা, সৌন্দর্য ও কার্যক্ষমতা হারাতে থাকে, মানব হৃদয়ও তেমনি হারাতে থাকে তার স্বভাব শক্তি। ফলে জীবনের বিশুদ্ধতা বিনষ্ট হতে থাকে, স্বাভাবিক-শুদ্ধ পথে চলা মন্থর হতে থাকে, হ্রাস পেতে থাকে পাপ প্রতিরোধের কুদরতী ক্ষমতা। আর তখনই মানুষ তার মানবমর্যাদা থেকে নিচে নামতে শুরু করে। সম্ভাবনার সকল দুয়ার থেকে দূরে সরতে থাকে। জীবন পর্যবসিত হয় গ্লানিমাখা ব্যর্থতায়।

এ করুণ বাস্তবতা মানব সমাজে কম তো নয়।

অন্তরের সুস্থতা-অসুস্থতা দেহেও প্রভাব ফেলে

বাস্তবেই, অন্তরজগতের অসুস্থতা শারীরিক অসুস্থতা থেকে মোটেও কম কিছু নয়। বরং অন্তরের অসুস্থতা অনেকক্ষেত্রে দেহের অসুস্থতা থেকেও বেশি ক্ষতিকর। কারণ, তাতে আখেরাতের ক্ষতি তো আছেই, দুনিয়াতেও আছে ঘৃণা, লাঞ্ছনা, বঞ্চনাসহ বহুবিধ ক্ষতি ও পেরেশানী। উপরন্তু অন্তরের অসুস্থতা মানবদেহকেও নানাভাবে অসুস্থ করে তোলে। দেহের সুস্থতার ক্ষেত্রে অন্তরের সুস্থতাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে— সেকথাও উল্লেখিত হয়েছে একটি হাদীসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ.

জেনে রাখ, নিশ্চয় দেহে একটি পিণ্ড আছে। সেটি যখন ঠিক হয়ে যায়, পুরো দেহ ঠিক হয়ে যায়। আর যখন সেটি নষ্ট হয়ে যায়, পুরো দেহই নষ্ট হয়ে যায়। জেনে রাখ, সেই পিণ্ডটি হল কলব। —সহীহ বুখারী, হাদীস ৫২; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৫৯৯

রুগ্ন অন্তরের অবস্থা

রুগ্ন দেহের মতো রুগ্ন অন্তরও এক সময় তার স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তাতে পঁচন ধরে। দুর্গন্ধ ছড়ায়। পাশের মানুষজন সেই গন্ধ অনুভব করে। কষ্ট পায়।

দেহের বড় একটি রোগ যেমন ক্যান্সার, অন্তরেরও ক্যান্সারতুল্য রোগ হল অহংকার ও হিংসা।

ক্যান্সারাক্রান্ত রোগীর যন্ত্রণা বর্ণনাতীত। দেহের ক্যান্সার দৃশ্যমান বলে তা মেশিনে ধরা পড়ে। অন্তরের ক্যান্সার অদৃশ্য বলে কোনো যন্ত্রে ধরা পড়ে না। তবে যন্ত্রণা অনভূত হয় দুটোরই এবং সকল কাজ-কর্মেই সে রোগের ছাপ থাকে।

এমনিভাবে অন্তরের অন্যান্য ব্যাধিগুলোর মধ্যে আছে লোভ, ক্ষোভ, কার্পণ্য, রিয়া বা লোকদেখানো মনোভাব, আত্মমুগ্ধতা, কুধারণা ও পরনিন্দা ইত্যাদি। এগুলো ছাড়াও ছোট-বড় আরো অনেক রোগ রয়েছে।

আমাদের উচিত অন্তরের রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে সচেতন হওয়া। এর চিকিৎসা করা। হৃদয় ও অন্তরকে পবিত্র করা এবং সুস্থ, স্বাভাবিক ও প্রশান্তির জীবন যাপন করা।

মন কি বলে আর প্রবৃত্তি কি চায়

প্রবৃত্তির বা নফসের চাওয়াকে না বুঝে আনুগত্য করলে যে ধরনের ক্ষতি হতে পারে তা মহান আল্লাহ কুর'আনে বলে দিয়েছেন।

লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যায় যে,সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠা যত কষ্টসাধ্য তেমনি সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামা ততটুকু বা তার চেয়েও অনেক সহজসাধ্য কাজ। আর তাই মানুষ উন্নত মর্যাদায় উঠতে যত কষ্ট-পরিশ্রম ও সচেতন থাকাটা প্রয়োজন, ঠিক নীচু স্তরের দিকে চলে যাওয়ার জন্য তেমন চিন্তা করতে হয় না শুধুমাত্র নফস ও শয়তানের প্ররোচনায় নিজেকে ছেড়ে দিলেই হয়ে যায়।

একজন মানুষ তার মর্যাদা থেকে নিচে পড়ে যাওয়ার জন্য আর কিছু লাগে না। ইবলিশ কিন্তু মহান রবকে বিশ্বাস করে ইবাদাতে মশগুল ছিল কিন্তু যখনই নফসের বিপরীত আনুগত্যের প্রশ্ন এসেছে সে নফসের অনুগত হয়ে মহান রবের অবাধ্য হয়েছিল এবং নফসের খুশির জন্যই মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া থেকে বিরত থেকে নিজের অন্যায় আচরনের উপর অটল ছিল। আর পরিনতিতে সে চিরবঞ্চিত, ধিকৃত ও জাহান্নামী হয়ে গেলো।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

কখনো কি তুমি সেই ব্যক্তির অবস্থা ভেবে দেখেছো, যে তার নিজের প্রবৃত্তির কামনাকে প্রভু রূপে গ্রহণ করেছে? তুমি কি এহেন ব্যক্তিকে সঠিক পথে নিয়ে আসার দায়িত্ব নিতে পার। তুমি কি মনে করো তাদের অধিকাংশ লোক শোনে ও বোঝে? তারা পশুর মতো বরং তারও অধম। (সূরা আল ফুরকান:৪৩-৪৪)

আবু উমামাহ রেওয়ায়াত করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

“এ আকাশের নীচে যতগুলো উপাস্যের উপাসনা করা হয়ে থাকে , তাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট উপাস্য হচ্ছে এমন প্রবৃত্তির কামনা করা যার অনুসরণ করা হয়।” (তাবরানী)

যে ব্যক্তি নিজের কামনাকে বুদ্ধির অধীনে রাখে এবং বুদ্ধি ব্যবহার করে নিজের জন্য ন্যায় ও অন্যায়ের পথের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়, সে যদি কোন ধরনের শির্কী বা কুফরী কর্মে লিপ্ত হয়েও পড়ে তাহলে তাকে বুঝিয়ে সঠিক পথে আনা যেতে পারে এবং সে সঠিক পথ অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর তার উপর অবিচল থাকবে এ আস্থাও পোষণ করা যেতে পারে। কিন্তু প্রবৃত্তির দাস হচ্ছে একটি লাগামহীম উট। তার কামনা তাকে যেদিকে নিয়ে যাবে সে পথহারা হয়ে সেদিকেই দৌড়াতে থাকবে। তার মনে ন্যায় ও অন্যায় এবং হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার এবং একটিকে ত্যাগ করে অন্যটিকে গ্রহণ করার কোন চিন্তা আদৌ সক্রিয় থাকে না। তাহলে কে তাকে বুঝিয়ে সঠিক পথে আনতে পারে! মহান আল্লাহ জানিয়েছেন,

আর কে তার চেয়ে বড় জালেম, যাকে তার রবের আয়াত শুনিয়ে উপদেশ দেয়ার পর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং সেই খারাপ পরিণতির কথা ভুলে যায় যার সাজ-সরঞ্জাম সে নিজের জন্য নিজের হাতে তৈরি করেছে ? (যারা এ কর্মনীতি অবলম্বন করেছে) তাদের অন্তরের ওপর আমি আবরণ টেনে দিয়েছি, যা তাদেরকে কুরআনের কথা বুঝতে দেয় না এবং তাদের কানে বধিরতা সৃষ্টি করে দিয়েছি। তুমি তাদেরকে

সৎপথের দিকে যতই আহবান কর না কেন তারা এ অবস্থায় কখনো সৎপথে আসবে না। (সূরা কাহফ:৫৭)

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ বলেন, “দ্বীনের জন্য সবচেয়ে সাহায্যকারী চরিত্র হলো: আল্লাহমুখী হওয়া এবং ধ্বংসের জন্য হলো প্রবৃত্তির গোলামী। প্রবৃত্তির গোলামীর মধ্যে হচ্ছে দুনিয়ামুখী হওয়া। দুনিয়ামুখী হওয়ার মধ্যে হলো সম্পদ ও পদের ভালবাসা। আর এই ভালবাসা এক পর্যায়ে হারামকে হালাল করে আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে নিয়ে যায়। আর আল্লাহর অসন্তুষ্টি এমন একটি রোগ যার ঔষধ আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া নিরাময় করা যায় না। আল্লাহর সন্তুষ্টি এমন একটি ঔষধ যার পরে আর কোন রোগ আক্রমণ করতে পারে না। অতএব যে তার আল্লাহকে সন্তুষ্টি করতে চাবে, তাকে তার প্রবৃত্তিকে নারাজ করাতেই হবে, কারন যে তার প্রবৃত্তিকে নারাজ করাতে পারবে না, সে তার প্রতিপালককে খুশি বা সন্তুষ্ট করতে পারবে না। আর মানুষ যখন তার প্রতি দ্বীনের কোন কাজ ভারী মনে করে ছেড়ে দিতে থাকবে, একদিন এমন হবে যে তার সাথে দ্বীনের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না”।

আলী ইবনে আবি তালিব বলেন, “আমি দুটি জিনিষকে বেশী ভয় পাই, বড় আশা ও প্রবৃত্তির গোলামী। কারন বড় আশা আখেরাতকে ভুলিয়ে দেয় এবং প্রবৃত্তির গোলামী সত্যকে গ্রহন করা থেকে বিরত রাখে। জেনে রেখো দুনিয়া পিছনে যাচ্ছে আর আখেরাত সামনে এগিয়ে আসছে। আর প্রতিটির সন্তান রয়েছে। তাই আখেরাতের সন্তান হওয়ার চেষ্টা করো, দুনিয়ার সন্তান হওয়ার চেষ্টা করোনা। এই দুনিয়াতে আমল আছে হিসেব নেই আর আখেরাতে হিসেব আছে আমল নেই”।

প্রবৃত্তির অনুসরণ করা, মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় ক্ষতিকর, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা একজন মানুষের উপর ফরয এবং তাকে প্রতিহত করা একজন মানুষের সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

আবু হাযেম রহ. বলেন, তুমি তোমার দুশমনের সাথে যেভাবে যুদ্ধ কর, তার চেয়ে আরও বেশি যুদ্ধ কর তোমার প্রবৃত্তির সাথে। (হুলিয়্যাতুল আওলিয়াহ ২৩১/৩)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"অক্ষম সে ব্যক্তি যে তার নফসকে তার প্রবৃত্তির অনুসারী বানায়" ইবনে মাযাহ: ৪২৬০ হাকেম হাদীসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন।

এ হাদিসে যে ব্যক্তি নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না তাকে অক্ষম বলা হয়েছে। বাস্তবে সে যতই শক্তিশালী হোক না কেন, সে যখন তার প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না তার চেয়ে দূর্বল ব্যক্তি দুনিয়াতে আর কেউ হতেই পারে না।

আত্মশুদ্ধি বা আত্মার চিকিতসা।

আত্মশুদ্বিকে আরবী ভাষায় তাযকিয়াতুন নফস বলা হয়। এখানে তাযকিয়াতুন কথাটি ঝায়িয়ুন হতে নির্গত হয়েছে যার অর্থ হল পবিত্র,নিষ্পাপ।আর তাযকিয়াতুন অর্থ হল পরিশুদ্ব করা,পাক করা, উদ্বুদ্ব করা এবং উন্নত করা। আর নফস এর অর্থ হল আত্মা।

আত্মশুদ্বির উপায়সমূহঃ

আত্মাকে বেশ কয়েকটি অবস্থায় বিশুদ্বতা অর্জন করা যায়। যেভাগে আত্মিক পরিশুদ্বতা অর্জন করা যায় তা নিম্নরুপঃ

১. ঈমান পরিশুদ্বকরনঃ

তাযকিয়াতুন নফসের চাবি হল ঈমান।আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনলে আত্মশুদ্বি হবে না।ঈমানদারদের জন্যেই আত্মশুদ্বি।কাফিরদের জন্য আত্মশুদ্বি নয়।সত্যিকারের আত্মশুদ্বি অর্জন করতে হলে ঈমানকে তাজা এবং শক্তিশালী করতে হবে।আর এই

ঈমানকে তাজা করার জন্য ইলেম অর্জন করতে হবে।ইলম ছাড়া ঈমান কখনও তাজা হবে না।আল্লাহ বলেন,

পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে।পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। আলাকঃ১-৫] এবং সঠিকভাবে তাউহিদের পরিচয় লাভ করা। তাউহিদ না জানলে ঈমানদারের দাবী করেও মুশরিক হয়ে থাকতে পারে।

২. তাকওয়াঃ তাকওয়া শব্দের অর্থ হল আল্লাহকে ভয় করা,সাবধান থাকা,সতর্ক থাকা,বিরত থাকা ইত্যাদি।শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহ পাকের ভয়ে যাবতীয় পাপাকার্য থেকে বিরত থাকের নাম হল তাকওয়া।তাকওয়ার দ্বারা যেকেউ নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ব করতে পারে।।আল্লাহ বলেন,

"তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, যারা পরহেযগার, আল্লাহ্ তাদের সাথে রয়েছেন"। [বাকারাঃ১৯৪]

"পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে,তার ঠিকানা হবে জান্নাত"। [নাযিয়াতঃ৪০-৪১]

৩.তওবাঃ

তওবা অর্থ হল অনুতপ্ত হওয়া,লজ্জিত হওয়া, ফিরে আসা,প্রত্যাবর্তন করা ইত্যাদি।অর্থাৎ,আল্লাহের হুকুম অমান্য করে বা সীমালঙ্ঘনকারী ব্যক্তি কর্তৃক চরম অনুশোচিত হয়ে আল্লাহর কাছে অপরাধ স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে বিনয়ের সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করার নাম হল তওবা। অর্থাৎ,গুনাহ করার পর সেখান তা থেকে যদি কেউ পরিত্রান পেতে চায় এরজন্য তাকে আল্লাহের কাছে সর্বপ্রথম একনিষ্ঠভাবে তওবা করতে হবে

যে আরধনার মাধ্যমে যেকেউ আল্লাহ পাকের সান্নিধ্য লাভ এবং আত্মপরিশুদ্বতা অর্জন করতে পারে।তওবার মানে শুধু এই না যে সে পাপের জন্য কেবল ক্ষমা চাবে না বরং সে পাপ কাজটি না করার জন্য সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকবে।অন্যথায় তা তওবা হবে। আল্লাহ বলেন,

“নিশ্চয় আল্লাহ তওবাকারীদের ভালবাসেন”[বাকারাঃ২২২]

রাসূলে করীম (সাঃ) বলেন, “তওবাকারীদের কোন গুনাহ থাকে না।।”

অর্থাৎ, তওবার দ্বারা অতি সহজে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা যায়।

৪.তাওয়াক্কুলঃ

সর্বাবস্থায় এক আল্লাহের উপর কেবল নির্ভর হওয়াকে তাওয়াক্কুল বলা হয়।তাওয়াক্কুলের ধারনা তাওহীদ হতে এসেছে।এক সর্বশক্তিমান আল্লাহের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর অন্য কোন শক্তি উপর নির্ভর করা ইসলামবিরোধী।ইমাম গাযযালি(র.) বলেন,”তাওয়াক্কুলের অবস্থা তিন ধরনের হয়।প্রথম অবস্থা হল এমন যে সে সাধারণভাবে আল্লাহের উপর নির্ভর করবে।দ্বিতীয়ত,তাওয়াক্কুলকারী ব্যক্তির অবস্থা এমন হবে যে একজন শিশু তার প্রতি ঠিক যেমন নির্ভর করে অর্থাৎ তার মাতা ছাড়া আর কারও আশ্রয় লাভ করে না ঠিক তদ্রুপ ঐ ব্যক্তি আল্লাহের প্রতি এমন নির্ভর করে থাকবেন। আর সবশেষ স্তর হল এমন যে সে পৃথিবীর কোন কিছুর প্রতি মুখাপেক্ষী নয় এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর প্রতি।আত্মশুদ্বির জন্য এটি একটি শক্তিশালী মাধ্যম। রাসূল (সাঃ) বলেন,

“তোমরা এমনভাবে তাওয়াক্কুল যেমনিভাবে একটি পাখি আল্লাহের প্রতি তাওয়াক্কুল করে।অর্থাৎ সে সকালে বের হয় অনাহারে আর বিকালে ঘরে ফিরবার পূর্বে পেটপূর্ণ হয়ে ফিরে আসে”। [তিরমিযী]

আল্লাহ বলেন,

“এ সত্ত্বেও যদি তারা বিমুখ হয়ে থাকে, তবে বলে দাও, আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত আর কারো বন্দেগী নেই। আমি তাঁরই ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।” [তওবাঃ১২৯]

৫. ইখলাসঃ

মুমীনগণ হৃদ্বের পবিত্রতা ও সরলতা রক্ষা করে চলে।তারা সর্বদা আল্লাহের ধ্যানে মশগুল থাকে।তারা তাদের চিন্তা-ধারার সময় আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে আনেন না।যাবতীয় সন্দেহযুক্ত কাজ বর্জন,বিবেকবিরোধী কাজ বর্জন করা এবং যা আল্লাহ থেকে দূরে নিয়ে যায় এমন কাজ বর্জন করা পবিত্রতা অর্জনের অন্যতম সহায়ক।আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন ও পার্থিব মোহ এড়ানোর মাধ্যমে মূমীনগণ অন্তরে পবিত্রতা অর্জন করেন।আল্লাহ বলেন,

“আপনি বলুনঃ আমার নামায, আমার কোরবাণী এবং আমার জীবন ও মরন বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে।” [আনআমঃ১৯২]

রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন,“ইখলাসওয়ালাদের জন্য সুসংবাদ হোক।তারা অন্ধকারে চেরাগস্বরুপ।তাদের দ্বারা কঠিন হতে কঠিন ফিৎনা দূর হয়”।[বায়হাকি]

[আনআমঃ১৯২]

৬. যিকিরঃ

যিকির মানেই আল্লাহকে স্মরণ করা। সকল কাজ সুন্নাত তরীকায় সম্পাদিত হলেই তা যিকিরে পরিণত হবে। নামায, রোজা,হজ্ব সব কিছুর মধ্যই যিকির আছে। তবে লিসানি বা যবানের সর্বত্তোম যিকির হলো কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত।

যে সকল জায়গায় যে মাসনুন দুআগুলি আছে তা আদায় করাও যিকির।

যিকিরের অনেক ফযিলত আছে।

আল্লাহ বলেন,

“সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখবো” [বাকারাঃ১৫২]

“ মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর এবং সকাল বিকাল আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর”।[আহযাবঃ৪১-৪২]

কুরআন তিলাওয়াতের আরো গুরুত্ব-

কুরআন তিলওয়াত হল নফল ইবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইবাদত।কুরআন তিলওয়াতের মাধ্যমে একজন বান্দার সাথে আল্লাহ পাকের কথোপকন হয় এবং যিকিরের মর্যাদা লাভ করতে পারে।তার মানবিক গুণাবলী বৃদ্বি পায়।রাসূল(সাঃ) বলেন, “লোহার উপর যেমন মরীচা পড়ে তেমনিভাবে মানুষের অন্তরের উপর মরীচা পড়ে।আর এই মরীচা দূর করার উপায় হল বেশি বেশি করে কুরআন তিলওয়াত এবং মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করা।”

৭. সুন্নাতকে অনুসরণঃ সুন্নাত অর্থ হল পথ।রাসূল(সাঃ)এর পথকে অনুসরণ করাকে সুন্নাত বলা হয়।সুন্নাতকে অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহর একজন প্রিয়বান্দা আত্মশুদ্বি অর্জন করতে পারে।মুসলমান হিসেবে সুন্নাতকে অনুসরণ করা সকলের জন্য জরুরি।আল্লাহ বলেন,

“বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ্ ও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন।” [ইমরানঃ১৩১]

“যে লোক রসূলের হুকুম মান্য করবে সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল।”[নিসাঃ৮০]

৮. নেক আমল করাঃ আত্মশুদ্ধি করার আরেকটি বিশেষ রাস্তা হল নেক আমল করা।শুধুমাত্র ঈমান থাকলে হবে না।ঈমানের দাবী অনুযায়ী কাজ করতে হবে।আর মানব সৃষ্টির অন্যতম লক্ষ্য হল আল্লাহ পাকের জন্য ইবাদত তথা নেক আমল করবে।এই ইবাদত –বন্দেগীর দ্বারা একজন বান্দা আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে পারে।আল্লাহ বলেন,

“আমি জীন এবং ইনসানকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য।” [যারিয়াতঃ৫৫]

১০. সালাত আদায়,যাকাত প্রদান,সিয়াম সাধনা এবং হজ্জ পালনঃ সালাত,সিয়াম,হজ্জ এবং যাকাত হল ইসলামের পঞ্চসম্ভের ভিতর অন্যতম।পারতপক্ষে এসকল আমল ছাড়া কেউ কখনও মুসলিম থাকতে পারে না।এসকল আমলসমূহের দ্বারা আত্মশুদ্ধি অর্জন করা যায়। এ ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে অসংখ্য উদ্বৃতি পাওয়া যায়।তা হলঃ

“নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে।”[আনকাবূতঃ৪৫]

“তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর যাতে তুমি সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং সেগুলোকে বরকতময় করতে পার এর মাধ্যমে” ।[তওবাঃ১০৩]

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পার।” [বাকারাঃ১৮৩]

১১. সবর করাঃ সবর অর্থ হল ধৈর্য।আর ধৈর্য হল ঐ বিষয়টি যার সাহায্যে একজন মানষ তার বিপদ-আপদ,সুখে-দুখে,ক্ষুধা-তৃষ্ণায়, অত্যাচার-অবিচার ইত্যাদি সর্বাবস্থায় এক আল্লাহের ইবাদত বন্দেগীতে মগ্ন থাকবে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের পথ

অনুসরণ করে।ধৈর্যের তিনটি স্তর রয়েছে।এক ধরনের ধৈর্য আছে যাতে মানুষের ভিতর কখন সবর থাকে আবার কখন থাকে না।আবার আরেকটি স্তর হল কখনো মন্দ অবস্থায় সে দিশেহারা হবে না।আর সর্বশেষ স্তরটি হল এমন যে সে কখনো দুঃখ-কষ্টের জন্য কখনও বিচলিত হবে না।এ সর্বশেষ স্তরের দ্বারা যে কেউ তার এই সবরের গুণে সূফিবাদের চরম লক্ষে পৌছে যায়।ইমাম গাযযালী (র.) বলেন, "ধৈর্য হল শয়তানের প্ররোচনা আত্মার নিম্নতর প্রবৃত্তি সম্পর্কে হুশিয়ারীতে পূর্ণ বিশ্বাস"। সবরের দ্বারা যে আল্লাহ পাকের ভালবাসা একান্তভাবে অর্জন করা যায় তা নিমোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমানিত হয়। আল্লাহ বলেন,

"হে মুমিন গন! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চিতই আল্লাহ্ ধৈর্য্যশীলদের সাথে রয়েছেন।"[বাকারা]

১২. শোকর আদায় করাঃ শোকর শব্দের অর্থ হল কৃতজ্ঞতা।আল্লাহ পাক একজন মানষকে যে হাত,পা,চোখ,নাক,কান,মুখ,বাতাস,রিযিক,পানি দিয়েছে তার জন্য আল্লাহের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নাম হল সাধারণভাবে শোকর।শোকর আদায়ের মধ্য দিয়ে একজন বান্দা আত্মশুদ্বিতা অর্জন করতে পারে।আল্লাহ বলেন,

"যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদেরকে আরও দেব" [ইব্রাহীমঃ৭]

১৩. আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণঃ একজন শিক্ষকের প্রতি তার ছাত্র পুরোপুরিভাবে আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত পূর্ণ শিক্ষা অর্জন করতে পারে না তেমনিভাবে আল্লাহের প্রতি সকল ক্ষেত্রে আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য না করা পর্যন্ত সে পরিপূর্ণ মারিফত অর্জন করতে পারবে না।তাই তাই আত্মশুদ্বির অন্যতম উপায় ও অন্যতম লক্ষ্য হল এক আল্লাহের প্রতি আত্মসমর্পণ করা।

১৪. পশুত্ব চরিত্র পরিবর্জনঃ শয়তান হল মানুষের চির শত্রু।শয়তান সর্বদা মানুষকে বিভিন্ন ধরনের পাপাচারে লিপ্ত হতে উদ্বুদ্ধ করে।এর দ্বারা কখনও আত্মশুদ্ধি সম্ভপর নয়।তাই আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য গীবত করা,মিথ্যা বলা,অপবাদ দেওয়া,উপহাস

করা,সুদ খাওয়া,ঘুষ খাওয়া,ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া ইত্যাদির মত জঘন্য অপরাধ হতে নিজেকে সার্বক্ষণিক মুক্ত রাখতে হবে।আল্লাহ বলেন,

"যে নিজেকে (আত্মাকে) শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ হয়"।

১৫. আত্মাকে স্বাভাবিক রাখাঃ আত্মাকে পাপমুক্ত রাখার মাধ্যমে একজন বান্দা অন্তরে বিশুদ্ধতা অর্জন করতে পারে।রাসূল(সাঃ) বলেছেন,

"শরীরের একটি মাংস আছে যদি তা পরিশুদ্ব হয় তবে গোটা শরীর পরিশুদ্ধ হয়।আর যদি তা খারাপ হয়,তবে সমস্ত শরীরই খারাপ হয়।মনে রেখো তা হল কালব বা দিল"।[বুখারী ও মুসলিম]

অর্থাৎ, মানুষকে চারিত্রিক দিক হতে পবিত্র রাখার জন্য অন্তরের পরিশুদ্বতার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

১৬ . পাপ হতে মুক্ত রাখাঃ নিজেকে কেউ যাবতীয় পাপকার্য থকে বিরত থাকার মাধ্যমে আত্মশুদ্বি অর্জন করতে পারে।রাসূল (সাঃ) বলেন,"মু'মিন যখন কোন পাপ করে তখন তার অন্তরে কালো দাগ পড়ে।সে যদি ক্ষমা চায় তাহলে তা দূর হয়ে যায়।"

১৭. আল্লাহের গুণে গুণান্বিতঃ আল্লাহ পাকের কতিপয় গুণাবলী যার গুণে গুণ্বানিত হয়ে আত্মশুদ্বি অর্জন করা যায়।আল্লাহ বলেন, "তোমরা আল্লাহর গুণে গুণ্বানিত হও।"

১৮. দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ সম্পাদনঃ দাওয়াত এবং তাবলীগী কাজের দ্বারা আত্মশুদ্বি অর্জন করা যায়।আল্লাহ বলেন,

"ঐ ব্যক্তির চেয়ে আর উত্তম কথা কার হতে পারে যে কথা মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে আর নিজে নেক আমল করে আর বলে আমি মুসলমানদের একজন।"[হামীম-সিজদাহঃ৩১]

আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব

নফসের পরিশুদ্ধি দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নফসের পরিশুদ্ধি ছাড়া মানুষের ঈমান ও ইসলাম কখনো বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ হয় না। মানুষের বাহ্যিক ও আত্মিক দুইটি দিক আছে। ইসলাম যেমন মানুষের বাহ্যিক তথা বাহিরের দিককে সুন্দর ও পরিপাটি করতে চায় তেমনি আভ্যন্তরীণ বা আত্মিক দিককেও করতে চায় সুন্দর ও সম্পূর্ণ কলুষমুক্ত। মানুষের আভ্যন্তরীণ তথা আত্মিক দিকের পরিশুদ্ধিকেই কোরআনের ভাষায় বলা হয় তাযকিয়াতুন নফস।

নফসের পরিশুদ্ধি কত বেশি প্রয়োজন তা এটাক উদাহরণের মাধ্যমে আমরা বোঝার চেষ্টা করতে পারি। যেমন- যদি কেউ বাহ্যিকভাবে প্রচলিত নিয়মে নামাজ রোজা হজ যাকাত পালন করে থাকে কিন্তু তার নফস পবিত্র ও পরিশুদ্ধ না হয়; তবে তার সে আমল হবে ওই ফুলের মতো, যার রং সুন্দর এবং দেখতে আকর্ষণীয় কিন্তু তার কোনো সুঘ্রাণ নেই। এগুলো হয়ে যাবে নিষ্প্রাণ ইবাদত।

ইসলামের আলোকে যদি কোনো ব্যক্তিকে পরিমাপ করতে হয় তবে দেখতে হবে তার নফস কতখানি পুতঃপবিত্র এবং কলুষমুক্ত। কেননা মহান আল্লাহ বান্দার অন্তরকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন, তার বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানকে নয়।

মনে রাখতে হবে, একজন মানুষ তার নফসকে পবিত্রকরণ ও মনের কলুষ দূরীকরনের মাধ্যমে নিজের আবেগ অনুভূতিকে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এমনভাবে নিয়োজিত করতে পারে যে, দ্বীনের বাহ্যিক ইবাদত-বন্দেগি তার আগে ও নফসের দাবিতে রূপায়িত হয়ে যাবে। কাজেই নফস পরিশুদ্ধ করা এবং এ উদ্দেশ্যে তার ওপর সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণ ও শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা দ্বীনের একটি অতি অপরিহার্য কর্তব্য এবং সবচেয়ে বড় জিহাদ।

দেহের যেমন রয়েছে দুটি অবস্থা সুস্থতা ও অসুস্থতা। ঠিক তেমনি আত্মারও রয়েছে সুস্থতা ও অসুস্থতা। দেহ অসুস্থ হলে যেমন চিকিৎসার মাধ্যমে তাকে সুস্থ করে তুলতে

হয়, তেমনি আত্মা রোগাক্রান্ত হলেও তাকে সুস্থ বা পরিশুদ্ধ করে তুলতে হয়। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন- وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْأَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا‘

আর শপথ নাফসের এবং তাঁর, যিনি তাকে সুঠাম করেছেন। এরপর তাকে অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। অবশ্যই সেই সফলকাম হবে যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করবে। আর অবশ্যই সেই ব্যর্থ মনোরথ হবে যে নিজকে কলুষিত করবে।’ (সুরা আশ-শামস : আয়াত ৭-১০)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য প্রথমে জ্ঞানের প্রয়োজন আর মানুষকে দুই রকম জ্ঞান দেয়া হয়েছে।

এক. অসৎকর্মের জ্ঞান,

দুই. সৎকর্মের জ্ঞান।

আয়াতের আলোকে পরিশুদ্ধির বিষয়টি দুইভাবে চিন্তা করা যায়-১. মন্দ দিক : যা আখলাকে সায়্যিয়াহ বা মন্দ চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য যাবতীয় পাপ, অন্যায় ও অপবিত্র কাজ থেকে মুক্ত হওয়া অর্থাৎ যাবতীয় অসৎ গুণাবলী বর্জন করা। যেমন- শিরক, রিয়া, অহংকার, আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা, হিংসা, ঘৃণা, কৃপণতা, ক্রোধ, গিবত, পরনিন্দা, চোগলখুরি, কুধারণা, দুনিয়ার প্রতি মোহ, আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া, জীবনের প্রতি অসচেতনতা, অর্থহীন কাজ করা, অনধিকার চর্চা প্রভৃতি হতে নিজেকে এবং দেহ ও আত্মাকে মুক্ত রাখা। আত্মা মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রুতে পরিণত হয় যখন সে তাকে পাপাচার ও সীমালংঘনের দিকে আহবান করে। কেননা এই অপরিশুদ্ধ, পাপাচারী, ব্যাধিগ্রস্ত অন্তর মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। মহান আল্লাহ তাআলা হজরত মুসা আলাইহিস সালামকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে- اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ‘

তুমি ফেরাউনের কাছে যাও, নিশ্চয় সে সীমালংঘন করেছে'। এরপর তাকে বল 'তোমার কি ইচ্ছা আছে যে, তুমি পবিত্র হবে? 'আর আমি তোমাকে তোমার রবের দিকে পথ দেখাব, যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর?' (সুরা আন নাযিআত : আয়াত ১৭-১৯)

২. ভালো দিক : যা আখলাকে হাসানা বা সচ্চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। উত্তম গুণাবলী দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধন করা। প্রশংসনীয় গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে পরিত্যাগকৃত অসৎ গুণাবলীর শূন্যস্থান পূরণ করা। সৎ গুণাবলী হল তাওহিদ, ইখলাছ, ধৈর্যশীলতা, তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা, তওবা, শুকর বা কৃতজ্ঞতা, আল্লাহভীতি, আশাবাদিতা, লজ্জাশীলতা, বিনয়-নম্রতা, মানুষের সাথে উত্তম আচরণ প্রদর্শন, পরস্পরকে শ্রদ্ধা-সম্মান ও স্নেহ, মানুষের প্রতি দয়া, ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শন, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ, পরোপকার প্রভৃতির মাধ্যমে সর্বোত্তম চরিত্র অর্জন করা। হাদিসে পাকে এসেছে-হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হলো

-أَىُّ النَّاسِ أَفْضَلُ قَالَ كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ صَدُوقِ اللِّسَانِ قَالُوا صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ قَالَ هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لاَ إِثْمَ فِيهِ وَلاَ بَغْىَ وَلاَ غِلَّ وَلاَ حَسَدَ ◌َ

কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম? তিনি বললেন, 'প্রত্যেক বিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী সত্যভাষী ব্যক্তি। তারা বলেন, সত্যভাষীকে তো আমরা চিনি, কিন্তু বিশুদ্ধ অন্তরের ব্যক্তি কে? তিনি বলেনঃ সে হলো পূত-পবিত্র, নিষ্কলুষ চরিত্রের মানুষ, যার নাই কোন পাপাচার এবং নাই কোন দুশমনি, হিংসা-বিদ্বেষ, আত্মহমিকা ও কপটতা। (ইবনে মাজাহ)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য দোয়া করতেন। হাদিসে পাকে এসেছে-হজরত যায়িদ ইবনু আরকাম রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেন, আমি কি তোমাদের কাছে তেমনই বলবো যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন

-اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا‘

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই, অক্ষমতা, অলসতা, কাপূরষতা, কৃপণতা, বার্ধক্য এবং কবরের আজাব থেকে। হে আল্লাহ! তুমি আমার নফসে (অন্তরে) তাকওয়া দান কর এবং একে পরিশুদ্ধ করে দাও। তুমি সর্বোত্তম পরিশোধনকারী, মালিক ও আশ্রয়স্থল। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই অনুপোকারী ইলম থেকে ও ভয় ভীতিহীন কলব থেকে; অতৃপ্ত নফসের অনিষ্ট থেকে ও এমন দোয়া থেকে যা কবুল হয় না।’ (মুসলিম)

অন্তর যদি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয়, তাহলে মানবদেহের বহ্যিক কার্যক্রমও পরিচ্ছন্ন, নির্মল ও কল্যাণকর হয়। আর যদি অন্তর অপবিত্র ও কলুষিত থাকে, তাহলে মানুষের বহ্যিক আচার-আচরণসহ তার সব কার্যাবলী অপরিচ্ছন্নতা ও অকল্যাণের কালো ছায়া পাওয়া যায়। নাফসের পরিশুদ্ধ করার মাধ্যমে একজন ব্যক্তির ঈমান, আমল ও আখলাক পরিশুদ্ধ হয়। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন- قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى‘নিশ্চয়ই সে সাফল্য লাভ করবে যে নিজেকে পরিশুদ্ধি করবে, আর তার রবের নাম স্মরণ করবে, এরপর নামাজ আদায় করবে। বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দাও। অথচ পরকালের জীবন সর্বোত্তম ও স্থায়ী।’ (সুরা আল-আলা : আয়াত ১৪-১৭)

নিজেকে পরিশুদ্ধির তিনটি দিক এ আয়াতে ওঠে এসেছে, তাহলো- এক. আল্লাহকে অধিক স্মরণ (জিকির) করা; দুই. নামাজ আদায় করা; তিন. পরকালকে প্রাধান্য দেওয়া এবং দুনিয়ার জীবনকে তুচ্ছ মনে করা। অন্য আয়াতে জানা যায়, দেহ ও আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য প্রথমে মুমিন হতে হবে। বিষয়টি মহান আল্লাহ এভাবে ঘোষণা করেন- وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى‘

আর যারা তাঁর কাছে আসবে মুমিন অবস্থায়, অবশ্যই সৎকর্ম করে তাদের জন্যই রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা। স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে স্থায়ী হবে আর এটা হল তাদের পুরস্কার যারা পরিশুদ্ধ হয়।' (সুরা ত্বহা : আয়াত ৭৫-৭৬)

এ আয়াতেও মহান আল্লাহ ব্যক্তিকে পরিশুদ্ধ হওয়ার জন্য প্রথমেই আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ ঈমান আনার কথা বলেছেন, তারপর অবশ্যই সৎকর্ম করতে হবে বলে উল্লেখ করেছেন, তবেই তাদের জন্য উচ্চ মর্যাদা, স্থায়ী জান্নাত সুনিশ্চিত।

আয়াতের আলোকে আরও বোঝা যায়, ঈমান বিষয়টি অন্তরের সাথে সম্পর্কিত। আর মানবদেহ পরিচালিত হয় তার কলব বা অন্তরের মাধ্যমে। এ কারণেই হাদিসে পাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন-

الاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ' ُ

আল্লাহ তাআলা সবাইকে এ অন্তর পরিশুদ্ধির তাওফিক দান করুন। দুনিয়া ও পরকালের সফলতা অর্জনের তাওফিক দান করুন। আমিন।

রমজানের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি

আল্লাহ তাআলা ১২ মাসের মধ্যে একটি মাস ইন্দ্রিয় সংযমের জন্য রোজা পালনের ব্যবস্থা করেছেন।

মনে রাখতে হবে, রমজান মাস ত্যাগের মাস, ভোগের নয়। রমজান মাস দান-খয়রাতের মাধ্যমে আখিরাত অর্জনের মাস, অধিক মুনাফার মাধ্যমে দুনিয়া অর্জনের মাস নয়। যদি কোনো ব্যক্তি বৈধ পন্থায় হালালভাবে ব্যবসা করেন, তবে আল্লাহ তাতেই বরকত দেবেন। অন্যায়ভাবে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে দ্বীনদার পরহেজগার রোজাদারদের কষ্ট দিলে, ওই অর্থ ও সম্পদ তার উপকারে না-ও আসতে পারে।

মুনাফার প্রতি মানুষের আকর্ষণ সহজাত। তাই আল্লাহ তাআলা মানুষের জীবনে প্রকৃত লাভ কী, তা বলে দিয়েছেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসার প্রতি নির্দেশনা দেব, যা তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? তা হলো তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ইমান আনবে এবং তোমাদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করবে। এটিই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পারো।' (সুরা-৬১ সফ, আয়াত: ১০)। এরপরও যারা দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন, তারা বিশ্বাসী দাবি করলেও আসলে তারা মুনাফিক। তাদের উদ্দেশে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তারা হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহি ক্রয় করেছে। ব্যবসায় তারা লাভবান হতে পারেনি; আর তারা হেদায়েতপ্রাপ্তও নয়।' (সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ১৬)।

রোজা মানুষকে সংযমী মনোভাব গড়ে তোলার অতুলনীয় শিক্ষা দেয়। সংযত ও নিষ্ঠাবান হওয়ার যে শিক্ষা সিয়ামে রয়েছে, আমরা যেন ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি, যার ওপর নির্ভর করবে প্রকৃত রোজাদারদের সংযম সাধনা। সব ধরনের অন্যায়, অশোভন, অনাচার, দুরাচার, পাপাচার, অকল্যাণকর কাজকর্ম থেকে বিরত হয়ে সংযম সাধনার পথ ধরে মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে আত্মসমর্পণের শিক্ষা দেয় এ মাহে রমজান। কিন্তু আমরা যদি নিজেদের মধ্যে সংযম ও আত্মসংশোধন না আনতে পারি এবং আগের মতো অন্যায় কাজে লিপ্ত থেকে রোজা

পালন করি, তাহলে এ ধরনের সিয়াম সাধনার কোনো মূল্যই আল্লাহর কাছে পাওয়া যাবে না। তাই সংযম সাধনার মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় একজন রোজা পালনকারী ইমানদার মুসলমানকে অবশ্যই হতে হবে বাক্সংযমী, লোভসংযমী, অপকর্মে সংযমী, নিদ্রায় সংযমী, নিষিদ্ধ কর্মে সংযমী, আচরণে সংযমী।

নফস' সম্পর্কে আলেম-উলামা ও সুফীদের বানী সমূহঃ

[বানীসমূহ সংগৃহিত]

নফসের লালসা দমনে যে অক্ষম, সে দূবর্লতম মানুষ। আর যে সক্ষম সে সবার্পেক্ষা শক্তিশালী।

***হযরত ইব্রাহিম দাউদ রুকী (রহঃ)।

নফসের কারাগারে যে বন্দী, সে আল্লাহর দরবারে পৌছতে পারে না ।

***হযরত্ ইবনে আতা (রহঃ)।

নফসের অনুগত হওয়া আর কারাবরনে কোন পাথর্ক্য নাই।

***হযরত আবু উসমান হিরী (রহঃ)।

আল্লাহর কাজে নফসকে বের করে দেয়াই হল বিশুদ্ধতার পরিচয়।

***হযরত জোনায়েদ বাগদাদী (রহঃ)।

শয়তান ও নফসের প্রলোভনের মধ্যে পাথর্ক্য হল লা-হাওলা কালিমা পাঠ করে শয়তানের ছলনা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় কিন্তু নফসকে তাড়ানো কঠিন, সে যা চায় তা না পাওয়া পযর্ন্ত পিছু হটে না। কখনো কখনো হয়তোবা উদ্দেশ্য পূরনে বিরত

হয়। কিন্তু অচিরেই সুপ্ত আকাংখাকে সে পুনরুজ্জীবিত করে। অতএব নফস শয়তান অপেক্ষা শক্তিশালী। আর এর মোকাবেলা করার জন্য পীরের দীক্ষা নিতে হয়।

***হযরত জোনায়েদ বাগদাদী (রহঃ)।

অন্তরকে পবিত্র রাখার অবলম্বনই হলো নফসকে সংযত রাখা।

***হযরত আহমদ ইবনে আসেম এন্তাকী (রহঃ)।

নফসের অনুসরন মানুষের সবর্নাশ ডেকে আনে। আর বিপদে অধৈয্যর্শীল মানুষ পরলৌকিক বিপদে জড়িয়ে পড়বে।

***হযরত মানসুর আম্মার (রহঃ)।

নফসকে যে প্রিয় মনে করে সে নফসের দ্বারা ফেরাউনী কাজ করে অর্থ্যাৎ অন্যায় অপকর্ম করে তার অশুভ পরিনাম ভোগ করে।

***হযরত হামদন কাচ্ছার (রহঃ)।

যিনি নফসের পবিত্রতা ও সরলতার প্রত্যাশী তিনিই আল্লাহর ওলী।

***হযরত আবু হাফস হাদ্দাদ খোরাসানী (রহঃ)।

নফসকে চিনতে না পারলে আল্লাহর দিকে অগ্রসর হওয়া কঠিন। অর্থ্যাৎ মন্দ প্রবৃত্তির তাড়নার প্রতি সজাগ না থাকলে আল্লাহর পথে চলা একেবারেই অসম্ভব।

***হযরত সহল ইবনে আব্দুল্লাহ তসতরী (রহঃ)।

নফসকে শাসনে রাখাই হলো দুনিয়া ত্যাগের প্রথম সোপান, দুনিয়া ত্যাগ হল তাওয়াক্কুলের প্রথম, আল্লাহর তুষ্টি লাভের প্রথম সোপান।

***হযরত সহল ইবনে আব্দুল্লাহ তসতরী (রহঃ)।

উদরপূর্ণ করে পানাহার করলে তা নফসের লালসার চরম মাত্রায় পৌছে দেয়। আর তখন মন্দ চাহিদাগুলো তাদের ইচ্ছা পূরনে উঠে পড়ে লেগে যায়। ***হযরত সহল ইবনে আব্দুল্লাহ তসতরী (রহঃ)।

দুনিয়াতে নফস ব্যতীত কোন কিছুকেই আমি ভয় করি না।

***হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজিরে মক্কী।গোপনে বা প্রকাশ্যে পাপ চিন্তা করো না। নিজের নফসকে যেকোন পাপ কাজ থেকে বিরত রাখ। ***হযরত হারেস মোহাসেবী (রহঃ)।

আমি যখন আমার নফসকে আল্লাহর দরবারে নিতে চাইলাম আর সে প্রত্যাখ্যান করলো তখন আমি একাই আল্লাহর দরবারে হাজির হলাম।

***হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ)।

[মন্তব্যঃ সুফীবাদী কথা]

মানুষের কু-প্রবৃত্তি প্রবল হলে অন্তর দুর্বল হয়, আর অন্তর সবল হলে কু-প্রবৃত্তি দুর্বল হয়।

***হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ)।

নফসের বাসনা যে ত্যাগ করেছে সে আল্লাহকে পেয়েছে। আর যে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেছে সবকিছুই তার নাগালে এসে গেছে।

***হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ)।

যে ব্যক্তি কু-প্রবৃত্তি দমন করে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হয়, আল্লাহ প্রকাশ্যে তার মযার্দা বৃদ্ধি করেন।

***হযরত যুন্নুন মিশরী (রহঃ)।

যে সবসময় নফসের অনুগত শয়তান তার কাছে বেশি যাতায়াত করে না, কেননা সে মনে করে নফসের মাধ্যমেই শয়তানের কর্ম সম্পাদিত হয়ে থাকে।

***হযরত মালেক বিন দিনার (রহঃ)।

মানুষের নফসকে খুব শক্ত শিকলে বেধে রাখতে হয়। পশুদের ক্ষেত্রে তেমন দরকার হয় না।

***হযরত হাসান বসরী (রহঃ)।

নফসকে সংযত রাখা ধৈয্যের লক্ষ।

***হযরত ইউসুফ আসবাত (রহঃ)।

নফসের বিরোধীতা করা সত্য ও সততার লক্ষন।

***হযরত ইউসুফ আসবাত (রহঃ)।

প্রকৃত সংযম ৪ টি। যথাঃ

১) অল্প আহার করা

২) অল্প কথা বলা

৩) অল্প শয়ন করা এবং

৪) নফসের কামনা ত্যাগ করা।

***হযরত আবু ইয়াকুব ইবনে ইসহাক নহর জওয়ান (রহঃ)।

দুনিয়া ও নফস থেকে দূরে সরে যাওয়া হলো আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্বের কারন।

***আবু মোঃ মোমতীয়েশ (রহঃ)।

নফসের তাড়না থেকে মুক্ত হওয়ার মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত শান্তি।

***হযরত আবু আব্দুল্লাহ ইবনে ফজল (রহঃ)।

মন্তব্যঃ

ভাল এবং মন্দ এক সাথে বাস করে না এবং দুনিয়া ও আখেরাত একত্রে বাস করে না। আর তাইতো মহান আল্লাহ জান্নাত ও জাহান্নাম পৃথকভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং যার যার কর্মফলের পুরস্কার হিসাবে সাজিয়ে রেখেছেন।

মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

"আর যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে আল্লাহর শরণাপন্ন হও তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।"

***সূরা আল-আরাফঃ আয়াত-২০০।

অতএব, আমার প্রার্থনা এই যেঃ-

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

"হে অন্তর সমূহের পরিবর্তনকারী! তোমার দ্বীনের উপর আমার অন্তরকে অবিচল রাখ।"

***তিরমিযীঃ ৩৪৪৪।

আমীন, আমীন, আমীন।।।